BHARATI INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH & DEVELOPMENT (BIJMRD)

(Open Access Peer-Reviewed International journal)

DOI Link: 10.70798/Bijmrd/020200010

Available Online: www.bijmrd.com|BIJMRD Volume: 2 | Issue: 2 | March 2024 | e-ISSN: 2584-1890

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রাগৈতিহাসিক : পোশাকের আড়ালে মানুষের আদিম প্রবৃত্তি

মানস কান্তি প্রামানিক

Research Scholar, Department of Bengali, RKDF University, Ranchi,

Email: pramanikmk@rediffmail.com

Abstract: *কথাকার মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্যজীবনের শুরুর দিকের একটি বিখ্যাত গল্প 'প্রাগৈতিহাসিক' আখ্যান, গাঁথুনি, ভাষাশৈলী -সব দিক দিয়েই আদর্শস্থানীয় একটি ছোটগল্প গল্পটিতে গল্পকারের স্বতন্ত্র জীবন অন্বেষার অনুসন্ধানের সাথে সাথে ফ্রয়েডীয় মনোবিকলন তত্ত্বের বাস্তব চিত্র উঠে এসেছে। গল্পকার গল্পের প্রধান চরিত্র ভিখু-র নৃশংসতা ও যৌনজীবনের জটিলতার মধ্যে দিয়ে মধ্যবিত্ত সমাজের রংমাখা কৃত্রিম জৌলুসের আড়ালে মানুষের অবচেতন মনে লুকিয়ে থাকা যৌনতা তাড়িত আদিম প্রবৃত্তির উদগ্র চিত্র গল্পে ফুটিয়ে তুলতে সচেষ্ট হয়েছেন। দেখিয়েছেন কীভাবে মানুষ নিজ অসহায়ত্বের নিকট আত্মসমর্পণ না করে, শত বাধা উপেক্ষা করে নিজ অভিপ্রায় অনুযায়ী বাঁচবার চেষ্টা করতে থাকে।*

Key Words: *মানিক, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, ছোটগল্প, প্রাগৈতিহাসিক, ফ্রয়েড, মনোবিকলন তত্ত্ব, যৌনতা, নৃশংসতা, আদিম প্রবৃত্তি*

Introduction:

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'প্রাগৈতিহাসিক' ছোটগল্পটি ১৯৩৭ খ্রিষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে প্রকাশিত তাঁর 'প্রাগৈতিহাসিক' নামেরই একটি গল্প-সংকলন গ্রন্থের একটি বিশিষ্ট গল্প। গল্পটি মানিকের একেবারে প্রথম দিকের গল্প। যেসময় কল্লোলীয়দের অবাধ যৌনতার ভাবনা ও প্রভাব মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় লক্ষ্য করেছিলেন। তাই এই গল্প সৃষ্টির মূলে কল্লোলীয়দের উপযোগী যৌনভাবনার স্পর্শ থাকতেও পারে বলে মনে হতে পারে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি সেভাবে তা গ্রহণ করেননি। বরং তিনি ফ্রয়েডীয় মনোবিকলন তত্ত্ব দ্বারা সবথেকে বেশি প্রভাবিত হয়েছেন এবং তাকে নিজ শিল্প-স্বভাব দিয়ে ভিন্ন তাৎপর্য দিয়েছেন। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্য- জীবনের সূচনা থেকেই জীবন সম্পর্কে একটা জিজ্ঞাসা ছিল। সে জিজ্ঞাসা প্রচলিত পথে, আবেগদীপ্ততায় বা মধ্যবিত্ত সেন্টিমেন্টাল স্বভাবে কখনোই মূল্য পায়নি। তাকে জীবন-আবির্ভাবের উৎস-চিহ্নিত মূল প্রকৃতিতে ধরার বিশেষ বাসনা ছিল আজীবন। ব্যক্তিগত জীবনে মধ্যবিত্ত সমাজের মানুষ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এই সমাজের কৃত্রিমতা, মুখে রঙ মাখার মতো উৎকট জৌলুসের উদগ্র চিত্র যে

তাঁকে এমন সিদ্ধান্ত গ্রহণে সাহায্য করেছিল সেকথা তিনি জানিয়েছেন 'সমুদ্রের স্বাদ' উপন্যাসের 'লেখকের কথা' শীর্ষক অংশে-

"মিথ্যার শূন্যকে মনোরম করে উপভোগ করার নেশায় মর মর এই সমাজের কাতরানি গভীরভাবে মনকে নাড়া দিয়েছিল। ভেবেছিলাম ক্ষতে ভরা নিজের মুখখানাকে অতি সুন্দর মনে করার ভ্রান্তিটা যদি নিষ্ঠুরের মত মুখের সামনে আয়না ধরে ভেঙে দিতে পারি, সমাজ চমকে উঠবে, মলমের ব্যবস্থা করবে।"[১]

অর্থাৎ সুন্দর পোশাক-পরা মেকি সভ্যতার আড়ালে যে আদিম স্বভাব আছে, তাকে বিকৃতি ও ভ্রষ্টতা দিয়ে ব্যাখ্যা করার প্রয়াস আছে, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তার যথাযথ সত্যতা চিত্রিত করতে চেয়েছিলেন তাঁর রচনায়। সেই সূত্রে মানুষের জীবনের মৌল রূপটি যতই আদিম হোক, কী তার আসল রূপ- এই ভাবনা ও অনুসন্ধান থেকেই রচিত হয় 'প্রাগৈতিহাসিক' গল্প।

Discussion:

'প্রাগৈতিহাসিক' গল্পের মধ্যে স্পষ্টত একটি কাহিনী আছে। এ গল্প ভিখু নামে এক দুর্দান্ত ডাকাতের জীবন-ইতিবৃত্ত। তার ডাকাতির সূত্র ধরে গল্পকার চরিত্র ছাড়িয়ে মানব-জীবন-স্বভাবের আদিমতম বৃত্তি, যৌনতা, ক্ষুধা-তৃষ্ণার হিংস্র বৈশিষ্ট্য এঁকেছেন শিল্পের সত্যতায়! গল্পের মুখ্য চরিত্র ভিখু বসন্তপুরের বৈকুণ্ঠ সাহার গদিতে ডাকাতি করতে গিয়ে কাঁধে বর্শার খোঁচায় আহত হয়, কিন্তু পালাতে সক্ষম হয়। এরপর ভিখুর ঘটনাবহুল দুর্গতি বাড়তে থাকে। নিজের পঙ্গুত্ব নিয়েও ক্রমেই আরো ভয়ংকর হয়ে ওঠে। কার্যতঃ এখান থেকেই গল্পের সূত্রপাত। এরপর গল্পের সংক্ষিপ্ত রূপ এই রকম- আহত ভিখু আত্মগোপনকালীন পরিস্থিতিতে একপর্যায়ে তার ডাকাতদলের সহযোগী অন্তরঙ্গ বন্ধু পেহ্লাদের বাড়িতে আশ্রয় নেয়। পেহ্লাদের অনুপস্থিতিতে একদিন সন্ধ্যায় তার স্ত্রী'র সঙ্গে ভিখু অশ্লীল আচরণ করে। পেহ্লাদ বাড়ি ফিরে বউয়ের কাছ থেকে এই ঘটনা জানতে পেরে প্রচন্ড ক্ষিপ্ত হয়ে ভিখুকে প্রচণ্ড প্রহার করে। ভিখু মার খেয়ে পেহ্লাদের বাড়ি থেকে বের হয়ে যায়। পেহ্লাদের ওপর প্রতিশোধ নিতে গভীর রাতে এসে তার ঘরে আগুন দেয়। পেহ্লাদের ঘর পুড়িয়ে ভিখু রাতে নদীপথে নৌকায় করে দূরে অন্যত্র চলে যায়। ভিখু অনেক দিন ধরে পলাতক অপরাধী হিসেবে পুলিশের চোখ ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে বেড়ায়। সব মিলিয়ে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ভিখু ভিক্ষাবৃত্তির জগতে প্রবেশ করে। শুরু হয় তার জীবনের দ্বিতীয় পর্ব। ভিখুর যন্ত্রণাদগ্ধ ভিখারি জীবনের আংশিক বর্ণনা করতে গিয়ে গল্পকার মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন-

"কাল বিকাল হইতে সে কিছু খায় নাই। দুজন জোয়ান মানুষের হাতে বেদম মার খাইয়া এখনও দুর্বল শরীরটা তাহার ব্যথায় আড়ষ্ট হইয়া আছে। ভোর ভোর মহকুমা শহরের ঘাটের রক্তের চিহ্ন ধুইয়া ফেলিয়া শহরের ভিতরে প্রবেশ করিল। ক্ষুধায় সে চোখে অন্ধকার দেখিতেছিল। একটি পয়সাও তাহার সঙ্গে নাই যে মুড়ি কিনিয়া খায়। বাজারের রাস্তায় প্রথম যে ভদ্রলোকটির সঙ্গে দেখা হইল তাহারই সামনে হাত পাতিয়া সে বলিল, দুটো পয়সা দিবান কর্তা? তাহার মাথায় জট বাঁধা চাপ চাপ রুক্ষ ধূসর চুল। কোমরে জড়ানো মাটির মত ময়লা ছেঁড়া ন্যাকড়া আর দড়ির মত শীর্ণ দোদুল্যমান হাতটি দেখিয়া ভদ্রলোকটির বুঝি দয়া হইল। তিনি তাহাকে একটি পয়সা দান করিলেন।"[২]

এভাবে প্রথম ভিক্ষাবৃত্তিতে হাতেখড়ি হয় ভিখুর। ভিক্ষা করা তার জীবন-জীবিকার জন্যই প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এখন প্রতিদিন সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত বাজারে তেঁতুলগাছের নিচে বসে ভিক্ষা করে। সারা দিনেও একবার খাওয়া জুটত

না যে ভিখুর, সেই ভিখু এখন ভিক্ষার আয়ে অনায়াসে দিন অতিবাহিত করে। তার শারীরিক অবস্থাও কিছুদিনের মধ্যে পূর্বের অবস্থায় ফিরে আসে, অতীতের যৌন উদ্দামতা আবার ফিরে পায়। নিঃসঙ্গ জীবনে নারীসঙ্গ পাওয়ার জন্য এখন তার মন হাহাকার করতে থাকে। ভিক্ষার ফাঁকে ফাঁকে সে চলে যায় বাজারের পাশের নদীর তীরে। নদীর ঘাটে মেয়েরা স্নান করার সময় স্নানরত মেয়েদের শরীর দেখা, যৌন সুড়সুড়ি দেওয়া, ভয় দেখানো ছিল তার মনের গোপন বাসনা। এরই মধ্যে ঘটনাচক্রে তার দেখা হয় ওই বাজারের আরেক ভিখারিণী পাঁচির সঙ্গে-

"বাজারে ঢুকিবার মুখেই একটি ভিখারিণী ভিক্ষা করিতে বসে। বয়স তাহার বেশি নয়, দেহের বাঁধুনিও বেশ আছে। কিন্তু একটা পায়ে হাঁটুর নীচে হইতে পায়ের পাতা পর্যন্ত তাহার থকথকে তৈলাক্ত ঘা।"[৩]

পাঁচির শারীরিক অসুস্থতা ও পায়ে থকথকে ঘা জেনেও ভিখু মাঝেমধ্যে তার কাছে বসে অন্তরঙ্গ আলাপ জমানোর চেষ্টা করে। একসময় পাঁচিকে প্রেম নিবেদন করে। ধীরে ধীরে পাঁচি প্রেমে আসক্ত হয়ে ওঠে ঠিকই, কিন্তু পাঁচি বেশ, সহজে ভোলার মেয়ে নয়। এর পরও নানা উপঢৌকন দিয়ে ভিখু প্রেম নিবেদন করতে থাকে। এখানে ভিখুর প্রেমের প্রতিপক্ষ হয়ে দাঁড়ায় পাঁচির ভিক্ষার সঙ্গী বসির। বসির ও পাঁচি একসঙ্গে থাকে, স্বামী-স্ত্রীর মতো বসবাস করে, পাশাপাশি বসে ভিক্ষাও করে। এ দৃশ্য সহ্য করতে না পেরে ভিখু বসিরের সঙ্গে ঝগড়ায় জড়ায়। ভিখুর জেদ ক্রমে বাড়তে থাকে, খুনের নেশা তার মাথায় চাপে। অবশ্য ভিখুর পক্ষে খুন করা কোনো বড় বিষয় নয়। জীবনে বহু খুন করেছে সে। ভিখু প্রস্তুতি নেয়, একটা ধারালো শিক সংগ্রহ করে পাথরে ঘষে সূঁচালো করে বসিরকে হত্যার অস্ত্র তৈরি করে। একদিন গভীর রাতে পাঁচি ও বসিরের কুঁড়েঘরে আচমকা হানা দিয়ে পেশাদার অপরাধী ভিখু ওই শিক ঢুকিয়ে হত্যা করে বসিরকে। একদিকে পাঁচির সামনে বসিরকে খুন করে সে যেমন তার বীরত্ব প্রমাণ করে, উল্টোদিকে অসহায় পঙ্গু ভিখারি পাঁচি ভিখুর নিষ্ঠুরতা প্রত্যক্ষ করে। ভিখু যেন হিংস্র বাঘের মতো শিকার ধরার পরম তৃপ্তি, আনন্দ, গর্ব অনুভব করে। বসিরের মৃতদেহ রেখে ভিখুর সঙ্গে পাঁচি অচেনা গন্তব্যে রওনা হয়।

গল্প এখানেই শেষ। গল্পের কাহিনী স্পষ্টত ঘটনাবহুল হলেও কাহিনী ও ঘটনার সমবায়ে তা এক আশ্চর্য শিল্পকর্ম হয়ে উঠেছে। কাহিনীর কেন্দ্রে ভিখু। যা কিছু ঘটনা ঘটেছে সবই ভিখুর জীবন-স্বভাবকে কেন্দ্র করে। লেখকের পর্যবেক্ষণ নিবিড় ও সংবেদী, তাই কাহিনী ও ঘটনার মধ্যে গল্পের প্লট এক নিখুঁত বৃত্ত-পরিকল্পনায় সমতা পেয়েছে। ভিখুর আদিম স্বভাব ও বাসনা, গল্পের শেষে পাঁচী-ভিখুর পারিবারিক যৌন জীবনের সংকেত ও তাদের পরবর্তী প্রজন্মে আদিম অন্ধকারাচ্ছন্ন মানব-স্বভাবের ধারাবাহিকতায় সূত্র-পরিচয়- এ সবের মধ্যে বৃত্তের পূর্ণরূপ। কাহিনী ও ঘটনার বৃত্ত-পরিধিটি ভিখু চরিত্রের রক্তনিহিত ভাবে কেন্দ্রের চারপাশে বলয়িত থেকেছে। একটি কাল্পনিক চরিত্রকে কেন্দ্র করে নির্মম নিরাসক্ত ইতিহাসকারের মতো ভূমিকায় নিজেকে স্থাপন করেছেন গল্পকার। এখানেই এই গল্পের অভিনবত্ব। চরিত্রের অন্তর্দ্বন্দ্ব, মনস্তাত্ত্বিক ঘাত-প্রতিঘাত ভিখুর চরিত্রে যে কাম্য নয়, গল্পের গঠন ও লক্ষ্য থেকেই তা বোঝা যায়। ভিখুর আদিম জীবন-স্বভাবের প্রতিচিত্রণ এবং তার সুগভীর তাৎপর্যের উৎস্থাপনাই গল্পের ও গল্পকারের লক্ষ্য। তাই কোনো ব্যক্তিচরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক রহস্য, জটিলতা ও সুষমার সন্ধান ভিখু চরিত্রে মিলবে না, সেটাই স্বাভাবিক। ভিখু সমগ্র গল্পে যা সক্রিয়তা দেখিয়েছে, তার সব কিছুই মানুষের জীবনের সভ্যতা-উদ্ভবের আগের আদিম জীবন-অনুগ। ভিখুর নৃশংস ডাকাত-জীবন তার চরিত্রের একটি শিক্ষা। গভীর অরণ্যে ক্ষত-ঘা শরীর নিয়ে বাঁশের মাচায় জীবনযাপন তাকে একেবারে আদিম মানুষই করে তোলে। পেহ্লাদের স্ত্রীর প্রতি আসক্তি, ভিক্ষাবৃত্তির জীবনে পাঁচীর জন্য আকর্ষণ,

যৌন-আর্তি, বসির মিঞাকে প্রবলতম ঈর্ষায় সভ্য সমাজের সমস্ত রকম নীতি-নিয়ম বহির্ভূত শ্বাপদ-স্বভাবে নির্মম হত্যা -এ সবই ভিখুর রক্তের বৈশিষ্ট্য। তার এই রক্ত সভ্যতায় পরিশীলিত নয়, আদিমতায় অকৃত্রিম।

মানুষের জন্মগত প্রবৃত্তির প্রজনান্তরিক ধারাবাহিকতা একটি বৈজ্ঞানিক সত্য। সুতরাং ভিখুর চরিত্রে যে একমুখী স্বভাব-বৈশিষ্ট্য তা তার স্রষ্টার আদিম জীবন-স্বভাব-ভাবনার তাৎপর্য অনুসারী। গল্প অনুযায়ী ভিখু স্বভাব-চরিত্রে সভ্য সমাজের সীমার বাইরের মানুষ। আর তার স্বভাবই সত্য হয়ে গোপন থাকে সভ্যতার কৃত্রিমতার আবরণে। যার মধ্যে মনুষ্যসুলভ দয়া-মায়ার লেশমাত্র নেই, জীবনের প্রচণ্ড বেগে যার শুধুই সম্পর্কে ভাঙচুর করতে করতে আদিম সরল অকৃত্রিম জীবনের স্বাদ-বৈচিত্র্য আস্বাদনই লক্ষ্য, তার কাছে মানবিক সম্পর্কের সীমা আশা করা একপ্রকার বৃথা। কিন্তু আমরা জানি আদিম জীবনের সরল অনাড়ম্বর দয়ামায়া ছিল; যা প্রয়োজনহীন, স্বার্থশূন্য, কিন্তু স্বতঃস্ফূর্ত। গল্পে বসিরকে হত্যা করে ভিখু পাঁচীকে নিয়ে নতুন জীবনের উপযোগী আশ্রয়ের জন্য বেরিয়ে পড়েছে গভীর রাতেই। পাঁচী সেই আদিম জীবনের উপযুক্ত সঙ্গিনী হয়েছে। তারও কোনো পিছুটান নেই, তার জন্য সামান্যতম আর্তি নেই। সে একজন ভিখিরি, ভিখুও তাই। দুজনের মিল তাই জীবন-স্তরের সমতায় সার্থক হয়েছে। কিন্তু ভিখুর মনের মধ্যেও মমত্ববোধ ক্ষণিকের জন্য উদয় হয়েছে পাঁচীকে কাঁধে নেওয়ার আগে-

"পায়ের ঘা লইয়া তাড়াতাড়ি চলিতে পাঁচীর কষ্ট হইতেছিল। ভিখু সহসা এক সময় দাঁড়াইয়া পড়িল। বলিল, 'পায়ে কি তুই ব্যথা পাস পাঁচী ?'

'হ, ব্যথা জানায়।'

'পিঠে চ্যাপামু ?'

'পারবি ক্যান ?'

'পারুম, আয়।'

ভিখুর গলা জড়াইয়া ধরিয়া পাঁচী তাহার পিঠের উপর ঝুলিয়া রহিল।"[(8)]

এই দু'জনের সম্পর্কের অন্তগূঢ় সারল্য ও অকৃত্রিমতা, দু'জনের মমতার বন্ধন- এর মূলেও আছে আদিম জীবনের প্রকৃতিপ্রদত্ত নির্দেশ। আসলে প্রত্যেকটি মানুষের মধ্যেই আছে এমন আদিম জীবন-স্বভাব। তার কখনো অবলুপ্তি নেই, তার মানব-বংশের উত্তরাধিকার সূত্রে বাঁধা। তার গোপন স্বভাব সভ্যতার আলোয় আরও গোপন থেকে যায়। আদিম জীবনের আকর্ষণও মানুষের মধ্যে স্বতঃস্ফূর্ত। জৈব প্রবৃত্তি, শ্বাপদবৃত্তি মানুষের রক্ত-চিহ্নিত সত্য। তারই প্রতিনিধি ভিখু এবং আগামীতে পাঁচীর গর্ভে ভিখুর সন্তান হয়ে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে সত্য-স্বরূপকে বাঁচিয়ে রাখতে সমর্থ।

পূর্বে উল্লেখিত হয়েছে যে মানিকের এই গল্প ফ্রয়েডীয় মনোবিকলন তত্ত্ব প্রভাবিত। ১৮৯৯ সালে ভিয়েনায় মনোরোগের চিকিৎসক সিগমুন্ড ফ্রয়েডের 'Die Traumdeutung' (ইংরেজি অনুবাদে 'The Interpretation of Dreams') নামে একটি বই প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থেই তিনি বহু আলোচিত মনোবিকলনবাদের (psychoanalysis) নান্দীপাঠ করেন। আদতে সাইকোঅ্যানালিসিস মনোরোগ চিকিৎসার একটি পদ্ধতি। পরবর্তীকালে তা-ই হয়ে ওঠে সাড়া জাগানো তত্ত্ব। এই তত্ত্বের মূলকথা হল যৌনাকাঙ্ক্ষাই মানুষের মনোজগতের মূল নিয়ন্ত্রক। ফ্রয়েডের মতে, মানুষের মনের দু'টি

অংশ- একটি সচেতন অংশ (the conscious mind) ও আরেকটি অচেতন অংশ (the unconscious mind)। এই দুই অংশের কার্যাবলিকে তিনি তিন ভাগে ভাগ করেছেন- ইদ (id), ইগো (ego), সুপারইগো (superego)। মানুষের সকল কার্য জৈবিক তাড়না বা লিবিডো নিয়ন্ত্রিত। লিবিডো সহ যাবতীয় আকাঙ্ক্ষার সম্মিলিত নাম ইদ। শিশু ক্রমশ বড় হতে হতে বুঝতে পারে যে, বাস্তব জগতে তার সকল আকাঙ্ক্ষার অনেক কিছুই অনৈতিক এবং তাই বাস্তবে পূরণীয় নয়। তখন সে নৈতিকতা, বাস্তব ও তার আকাঙ্ক্ষার মধ্যে একটি সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা করে। এই প্রয়াসের মধ্য দিয়ে অর্জিত সেই মধ্যবর্তী জায়গাটিই হল ইগো। ইগোতে পৌঁছতে হলে ইদকে মনের সচেতন অংশ থেকে সরাতে হয়। এই সরানোর অনেকগুলো প্রক্রিয়া আছে। যেমন, repression, displacement, denial, projection এবং regression। এদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত প্রক্রিয়া হল রিপ্রেশন বা অবদমন। এই প্রক্রিয়ায় সকল অবদমিত কামনা মনের সচেতন অংশ থেকে সরে গিয়ে অচেতন অংশে জমা হয়। এইভাবে ইগো বাস্তবতা ও নৈতিকতার সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়ানোর চেষ্টা করে। আর সুপারইগোর কাজ হল, নৈতিকতার পথে আরও এক ধাপ এগিয়ে সমাজের সকল প্রকার নৈতিক বিধিনিষেধ সম্পর্কে সচেতন থাকা এবং সে অনুযায়ী নিজের কার্যাবলি নিয়ন্ত্রণের মানসিক প্রয়াস সাধন।

প্রাগৈতিহাসিক' গল্পে মানুষের নিয়ন্তা যে জৈবিক তাড়না বা লিবিডো ফ্রয়েডের এই নিরীক্ষণ কেন্দ্রীয় চরিত্র ডাকাত ভিখুর জীবন আখ্যানের মধ্য দিয়ে মূর্ত হয়ে উঠেছে। ভিখু যেভাবে বেঁচে উঠল, তার নিহিত কারণ তার লিবিডো। এই লিবিডোর অন্তর্নিহিত শক্তিই তার মৃতপ্রায় দেহে প্রাণের সঞ্চার করল-

“মরিবে না। সে কিছুতেই মরিবে না। বনের পশু যে অবস্থায় বাঁচে না সেই অবস্থায় মানুষ সে বাঁচিবেই।”[৫]

এই লিবিডোর তাড়নাতেই সে পেহ্লাদের স্ত্রীকে যৌন সম্ভোগ করতে চায়। প্রবল যৌনক্ষুধায় সে নদীর ঘাটে মেয়েরা স্নান করতে নামলে ভিক্ষা চাইবার ছলে জলের ধারে গিয়ে দাঁড়ায়। মেয়েরা ভয় পেলে সে খুশি হয় এবং সরে যেতে বললে নড়ে না, দাঁত বের করে দুর্বিনীত হাসি হাসে। রাতে স্বরচিত শয্যায় সে কাম-বাসনায় ছটফট করে। চারিদিকের সবকিছুকে আপণ করে পেতে ইচ্ছে করে ভিখুর-

“নদীর ধারে খ্যাপার মতো ঘুরিতে ঘুরিতে তার মনে হয় পৃথিবীর যত খাদ্য ও যত নারী আছে একা দখল করিতে না পারিলে তাহার তৃপ্ত হইবে না।”[৬]

প্রেমের প্রতিদ্বন্দ্বী বসিরকে খুন করে পাঁচীকে কাঁধে তুলে নিয়ে আদিম উল্লাসে পা বাড়ায়। যা আসলে ফ্রয়েডের ‘যৌন সর্বস্ববাদ’ (Pan-Sexuality)-এর ফলশ্রুতি। ফ্রয়েডের তত্ত্বে কাম হলো একজন মানুষের জৈবিক সংগঠনের মৌলিক উপাদান এবং এর ফলে একটি শিশু জন্মের সাথে সাথে। আত্মকামী সত্তা হিসেবে যৌন অনুভূতিমূলক কামপ্রবৃত্তির দিকে এগিয়ে যায়। এটি শিশুর জন্মের পর নিজেকে ছাড়া অন্য কাউকে স্বাধীন সত্তা হিসেবে গ্রাহ্য করে না। বয়স বাড়ার সাথে সাথে একটি কিশোর যখন তার সমবয়স্ক অন্য কিশোরের ভালোবাসা কামনা করে, মনস্তাত্ত্বিক কারণেই এক ধরনের কামপ্রবৃত্তি সৃষ্টি হয় এবং বয়স বাড়ার সাথে সাথে এই সমকাম নারী পুরুষ কেন্দ্রিক বিপরীত লিঙ্গের প্রতি যৌন কামনার বিষয়বস্তু হয়ে ওঠে। কামপ্রবৃত্তি উপাদান হিসেবে আরও অনেক বিষয়ে ফ্রয়েড তাত্ত্বিক ধারণা দিয়েছেন, যেমন ইদিপাস (Oedipus complex), এষণা (Electra complex), মর্ষকাম (Masochism), ধর্ষকাম (Sadism), জীবনবৃত্তি, মরণপ্রবৃত্তি ইত্যাদি। লেখক স্বয়ং ভিখু ও পাঁচীর এই গল্পকে ‘অন্ধকারের গল্প’ হিসাবে চিহ্নিত

Published By: www.bijmrd.com ll All rights reserved. © 2024

করেছেন। এই চিহ্নিতকরণ যথাযথ কি না তা নিয়ে তর্ক চলতে পারে। তবে যৌনতার শ্রেণীচরিত্র ও মনের অন্ধকার জগৎ-ই যে এই গল্পের অন্তর্নিহিত চালিকাশক্তি, তা নিশ্চিতভাবেই বলা যায়।

Conclusion:

কথাসাহিত্যের বড় একটি অংশে আমরা প্রত্যক্ষ করি নায়কের নোঙর ছিঁড়ে জীবনের নৌকাটি টালমাটাল হয়ে পড়েছে। এই প্রেক্ষিত জমিদারের জন্য যেমন সত্য, তেমন ডোম-চাঁড়ালের ক্ষেত্রেও সমধিক সত্য। তখন নায়ক একদিকে, আর পৃথিবী আরেক দিকে। এই দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়েই গল্পের প্লট জমে ওঠে। কখনো এই দ্বন্দ্বের সমাধান হয়, কখনো থাকে অমীমাংসিত। প্রাগৈতিহাসিক গল্পের ভিখু এমনই একটি চরিত্র। জীবনানন্দের নায়ক যখন নিজ অসহায়ত্বের নিকট আত্মসমর্পণ করে দিনাতিপাত করে, তখন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভিখু শত অসামর্থ ও বাধা উপেক্ষা করে বাঁচবার, বিশেষ করে নিজ অভিপ্রায় অনুযায়ী বাঁচবার চেষ্টা করতে থাকে। ভিখুর এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। এই গল্পে ভিখু সেই মানুষের প্রতিভূ, যে পরাস্ত হতে জানে না। গল্পটি লেখার প্রায় সাত বছর পরে (১৯৪৪) মার্ক্সীয় দর্শনে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় দীক্ষিত হয়েছিলেন। কিন্তু ভিখুর চরিত্রে আমরা প্রত্যক্ষ করি একটি মার্ক্সীয় রাজনৈতিক অভিজ্ঞান, যাহা হয়তো লেখকের উদ্দীষ্ট ছিল না। সর্বরূপ সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও ভিখুর যে দ্রোহ, তা অগ্রহণযোগ্য সমাজের বিরুদ্ধে বিপ্লবেরই নামান্তর। যদিও প্রাগৈতিহাসিক রাজনৈতিক গল্প নয়, তবুও এর রাজনৈতিক তাৎপর্য সচেতন পাঠকের দৃষ্টি এড়ায় না। গল্পের নাম প্রাগৈতিহাসিক হওয়ার পশ্চাতেও গল্পকার একটি দার্শনিক ব্যাখ্যা গল্পের শেষাংশে জুড়ে দিয়েছেন-

“পথের দু’দিকে ধানের ক্ষেত আবছা আলোয় নিঃসাড়ে পড়িয়া আছে। দূর গ্রামের গাছ-পালার পিছন হইতে নবমীর চাঁদ আকাশে উঠিয়া আসিয়াছে। ঈশ্বরের পৃথিবীতে শান্ত স্তব্ধতা। হয়তো ওই চাঁদ আর এই পৃথিবীর ইতিহাস আছে। কিন্তু যে ধারাবাহিক অন্ধকার মাতৃগর্ভ হইতে সংগ্রহ করিয়া দেহের অভ্যন্তরে লুকাইয়া ভিখু ও পাঁচী পৃথিবীতে আসিয়াছিল এবং যে অন্ধকার তাহারা সন্তানের মাংস আবেষ্টনীর মধ্যে গোপন রাখিয়া যাইবে তাহা প্রাগৈতিহাসিক, পৃথিবীর আলো আজ পর্যন্ত তাহার নাগাল পায় নাই, কোনো দিন পাইবেও না।”[৭]

সূত্রনির্দেশ:

(১) সমুদ্রের স্বাদ, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, লেখকের কথা, দি বুকম্যান, কলকাতা, ১৩৫২

(২) প্রাগৈতিহাসিক, মানিক রচনাসমগ্র (২য় খণ্ড), পৃষ্ঠা- ১৭৩, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, ১৯৯৯

(৩) পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ১৭৫

(৪) পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ১৭৯

(৫) পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ১৭২

(৬) পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ১৭৭-১৭৮

(৭) পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ১৭৯

সহায়ক গ্রন্থ

বন্দ্যোপাধ্যায় মানিক, মানিক রচনাসমগ্র (২য় খণ্ড), পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, ১৯৯৯

সরকার সুনীল কুমার, ফ্রয়েড, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা ১৯৫৯

Freud Sigmund, The Interpretation Of Dreams, The Macmillan Company, New York, 1913

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : ফ্রয়েড থেকে মার্কস, জলার্ক সাহিত্য পত্রিকা, কলকাতা, শ্রাবন ১৩৯৭

রায়চৌধুরী গোপিকানাথ, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : জীবনদৃষ্টি ও শিল্পরীতি, জি এ ই পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৮৭

ঘোষ শিখা, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্প : অবয়বগত বিশ্লেষণ, মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা, ১৯৯০

মিত্র সরোজমোহন, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবন ও সাহিত্য, গ্রন্থালয় প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, ১৩৮৯

বসু নিতাই, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমাজ জিজ্ঞাসা, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৮৬

ঘোষ সুজিত, মানিক সাহিত্যে অবচেতন, মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা, ২০০৩

বন্দ্যোপাধ্যায় মধুমিতা, মানিকের ছোটগল্পে মনস্তত্ত্ব, দি জেনারেল বুকস, কলকাতা, ২০০২

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, পুড়ে যায় জীবন নশ্বর, গণশক্তি, কলকাতা, ১৯৯৯

বসু কৃষ্ণা, ছোটগল্পকার মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : শিল্পরূপ ও জীবনবোধ, প্রতিভাস, কলকাতা, ২০০৩

হক সৈয়দ আজিজুল, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্প : সমাজচেতনা ও জীবনের রূপায়ন, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৮

Citation: প্রামানিক, মা.কা., (2024) "মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রাগৈতিহাসিক : পোশাকের আড়ালে মানুষের আদিম প্রবৃত্তি".*Bharati International Journal of Multidisciplinary Research & Development (BIJMRD)*, Vol-2, Issue-2, DOI Link: 10.70798/Bijmrd/020200010